শ্রমিক ও শিল্প রক্ষায় নিম্নতম মজুরি

জলি তালুকদার

গত তিন দশক ধরে গড়ে ওঠা পোশাকশিল্পের যে সাফল্য ও শ্রেষ্ঠত্বের কথা আজ ব্যাপকভাবে প্রচারিত হয় তার পেছনের ইতিহাস আসলে কী? কৃতিত্বের গৌরবটাই বা কার? ইতিহাসটা তীব্র শ্রম শোষণের ইতিহাস, যে কথা সাধারণত বলা হয় না। আর যে শ্রমিকদের অতি সস্তা শ্রমে আজ এই শিল্প এতদূর এল, যাদের সীমাহীন আত্মত্যাগে দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের এত বাহাদুরি, কৃতিত্বের মাল্য তাদের গলায় কখনই জোটে না। আমাদের দেশের অধিকাংশ মালিক মনে করেন, তাঁদের বিশেষ ক্যারিশমা দিয়ে তাঁরা পোশাকশিল্পকে আজকের এই গুরুত্বপূর্ণ অবস্থানে নিয়ে এসেছেন। তাঁরা এই খাতের প্রায় ৫০ লাখ শ্রমিকের অবদান এবং সরকারি পৃষ্ঠপোষকতাসহ অন্যান্য সুবিধা ও আনুকূল্যকে অস্বীকার করে থাকেন। তাঁরা সব সময়ই নিজেদের ব্যর্থতার দায়ভার অন্যের ওপর চাপানোর চেষ্টা করেন। এমনকি তাজরীন, রানা প্লাজার মত নৃশংস শ্রমিক হত্যাকান্ডের পর তাঁদের প্রকৃত চরিত্র যখন বিশ্বব্যাপী উন্মোচিত হলো, তখনও আমরা তাঁদের অন্ধ অহমিকার কমতি দেখি না।

আমাদের পোশাকশিল্পের বিকাশের পেছনে রয়েছে শ্রমিকের সস্তা শ্রম। এর সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে আছে শ্রমিকের লাশ, রক্ত, স্বজন হারানোর বেদনা, অসংখ্য মানুষের কান্না আর আহাজারি। এর কোনটিকেই আমরা অস্বীকার করতে পারি না। আজ বিশ্ববাজারে বাংলাদেশের পোশাকশিল্প একটি শক্তিশালী অবস্থান করে নিয়েছে। শুধু তা-ই নয়, গত কয়েক দশকে বাংলাদেশের অর্থনীতির মূল চালিকাশক্তিতে পরিণত হয়েছে পোশাকশিল্পের শ্রমিকরা।

অথচ এই শ্রমিকরা যখনই কোন ন্যায্য দাবি উত্থাপন করে, তখনই সবাই মিলে গেল গেল একটা রব তোলা হয়। গার্মেন্ট শিল্পের 'ক্রয় আদেশ অন্য দেশে চলে যাবে'–এই জুজুর ভয়কে শ্রমিক ঠকানোর প্রধান হাতিয়ারে পরিণত করা হয়েছে। প্রশ্ন হচ্ছে, তাজরীন ও রানা প্লাজার নৃশংস হত্যাকাণ্ডের পরও কি বিশ্ববাজারে বাংলাদেশের অবস্থান খুব বেশি ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছে? প্রকৃতপক্ষে বড় বড় ক্রেতা প্রতিষ্ঠানগুলো বাংলাদেশ থেকে মুখ ফেরায়নি। শ্রমিকের সস্তা শ্রমে উৎপাদিত পোশাক উন্নত দেশগুলোতে চড়া দামে বিক্রি করে তারাও মুনাফার পাহাড় গড়ছে। আমাদের মুনাফালোভী মালিকদের পাশাপাশি ওই ক্রেতাদের সময় ও চাহিদামত শিপমেন্ট করার চাপ রানা প্লাজার হত্যাকাণ্ডের জন্য কম দায়ী নয়। পরবর্তী সময়ে আমরা দেখেছি, নিজেদের ভাবমূর্তি রক্ষার্থে নানান হুমকি দিলেও সস্তা শ্রমের লোভে তারা তাদের ক্রয়াদেশ প্রায় ঠিকই রেখেছে। যুক্তরাষ্ট্র আরও কয়েক ধাপ এগিয়ে নাটক করেছে জিএসপি কোটা নিয়ে। তাদের জিএসপি কোটা বাতিলের বিষয়টি কোনভাবেই নিরাপদ কর্মস্থল ও শ্রমিক স্বার্থসংশ্লিষ্ট নয়; বরং রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত। দেশি মালিক ও আন্তর্জাতিক ক্রেতা সংস্থাগুলো–উভয়েই আজ বাংলাদেশের পোশাকশিল্পের শ্রমিকদের অমানবিক ও মানবেতর জীবনের জন্য দায়ী। পৃথিবীর অন্যান্য দেশের তুলনায় সবচেয়ে কম মজুরিতে পোশাক শ্রমিকরা বাংলাদেশে তাদের শ্রম বিক্রি করতে বাধ্য হয়। আমাদের দেশ পোশাকশিল্পে পৃথিবীর দ্বিতীয় সর্বোচ্চ রফতানিকারক, কিন্তু সর্বনিম্ন মজুরিদাতা। আমাদের মালিকরা কোন ধরনের দর-কষাকষি ছাড়াই আন্তর্জাতিক ক্রেতাদের থেকে অর্ডার নেন এবং নিজেরা অধিক মুনাফা লাভের জন্য শ্রমিকের ওপর তীব্র শ্রমশোষণ চালান।

আশির দশকে গড়ে উঠলেও ১৯৯৪ সালে প্রথমবার পোশাকশিল্পে ন্যূনতম মজুরি ৯৬০ টাকা নির্ধারণ করা হয়। ১২ বছর পর অর্থাৎ ২০০৬ সালে শ্রমিকের প্রবল আন্দোলনের মুখে মজুরি বোর্ড গঠন করা হয়। শ্রমিক সংগঠন ও শ্রমিকদের পক্ষে ন্যূনতম মজুরি ৩০০০ টাকা করার জোরালো দাবি উঠলেও মাত্র ১৬৬২ টাকা ন্যূনতম মজুরি ঘোষণা করা হয়, যা পোশাক শ্রমিক ও তাদের সংগঠনগুলো সে সময় প্রত্যাখ্যান করে। তিন বছর পর আবার নতুন মজুরি বোর্ড গঠন করার ঘোষণা দেয়া হয়েছিল। কিন্তু দুই মজুরি বোর্ডের মধ্যবর্তী সময়ে কয়েক দফা বাড়িভাড়া ও মূল্যবৃদ্ধি সত্ত্বেও মালিক ও সরকারের পক্ষ থেকে কোন উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়নি। অন্যদিকে দীর্ঘদিন ধরে শ্রমিক সংগঠন ও পোশাক শ্রমিকদের পক্ষ থেকে দুই মজুরি বোর্ডের মধ্যবর্তী সময়ে মহার্ঘ ভাতার দাবি জানানো হয়েছিল, যাতে পোশাক শ্রমিকদের মজুরি বাজারদরের সঙ্গে কিছুটা সামঞ্জস্যপূর্ণ হয়। কিন্তু সে দাবির বিষয়ে সরকার বা মালিকপক্ষ কেউই কর্ণপাত করেনি। ফলে ২০১০ সালে মজুরি বৃদ্ধির দাবিতে শ্রমিকরা বিক্ষোভে ফেটে পড়ে। শ্রমিক সংগঠনগুলো দেশের অর্থনীতিবিদ ও পুষ্টিবিজ্ঞানীসহ বিশেষজ্ঞদের সহযোগিতায় বাজারদরের সঙ্গে সংগতি রেখে এবং মালিকদের অবস্থান বিবেচনায় রেখে সে সময় ন্যূনতম মজুরি ৫০০০ টাকার দাবি উত্থাপন করেছিল। তখন সব মহল থেকে মালিকদের অনুরোধ করা হয়েছিল, তাঁদের উগ্র বিলাসিতা পরিহার করে শ্রমিকদের ৫০০০ টাকা মজুরি দিলে উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি পাবে, তাতে তাঁরাই বেশি লাভবান হবেন। কিন্তু সেবার ন্যূনতম মজুরি ৩০০০ টাকা নির্ধারণ করা হয়, যা পরবর্তীতে কার্যকর করতে এক বছর লেগে যায়। শ্রমিকরা সেদিন ৩০০০ টাকা নিম্নতম মজুরির ঘোষণা প্রত্যাখ্যান করেছিল। নতুন মজুরি হার ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে শ্রমিকদের ব্যাপক আন্দোলন শুরু হয়। শ্রমিকের যৌক্তিক ও ন্যায্য দাবিকে উপেক্ষা করে মালিকদের সহযোগিতা করার জন্য সরকার শ্রমিক ও নেতাদের ওপর ব্যাপক হারে গ্রেফতার-হামলা-মামলা, ছাঁটাই-বরখাস্ত ও দমন-পীড়ন শুরু করে।

২০১০ সালের পর কয়েক দফা মূল্যবৃদ্ধির ফলে ২০১২ সাল থেকে নিম্নতম মূল মজুরি ৮০০০ টাকার দাবিতে শ্রমিকরা আন্দোলন শুরু করে। রানা প্লাজার ভয়াবহ শ্রমিক হত্যাকাণ্ডের পর তৈরি হওয়া তীব্র ক্ষোভ ও শ্রমিক অসন্তোষ সামাল দিতে সরকার দ্রুত ২০১৩ সালে নতুন মজুরি বোর্ড গঠন করে। প্রতিবারের মত সেবারও মজুরি বোর্ডে শ্রমিকদের প্রকৃত প্রতিনিধি নির্বাচিত না করে সরকার ও মালিকদের পছন্দের ব্যক্তিকে শ্রমিকপক্ষের প্রতিনিধি মনোনীত করা হয়। ফলে পূর্বের মত মজুরি বোর্ড নিয়ে শ্রমিকদের মধ্যে অবিশ্বাস ও সন্দেহ থেকে যায়। সেই সন্দেহ সঠিক বলে প্রমাণিত হয় যখন সেই মজুরি বোর্ড ৩০০০ টাকা বেসিক ধরে ৫৩০০ টাকা মোট মজুরি ঘোষণা করে। তার প্রতিক্রিয়ায় শ্রমিকরা যে আন্দোলন গড়ে তুলেছিল তা নির্মম বল প্রয়োগে দমন করা হয়। আজ প্রায় পাঁচ বছর পর শ্রমিকরা আবারও মজুরি বৃদ্ধির আন্দোলনে নেমেছে।

এবার শ্রমিকরা মূল মজুরি ১০০০০, বাড়িভাড়া ৪০০০, চিকিৎসা ভাতা ১০০০, যাতায়াত ভাতা ১০০০ টাকাসহ সর্বমোট ১৬০০০ টাকা ন্যূনতম মজুরি দাবি করেছে। শ্রমিকরা হঠাৎ করে এই দাবি উত্থাপন করেনি। গত দেড় বছর ধরে বিভিন্ন সভা-সমাবেশ, কর্মী সম্মেলন, মালিক সমিতি ও শ্রম প্রতিমন্ত্রী বরাবর স্মারকলিপি প্রদানের মধ্য দিয়ে আমাদের ১৬০০০ টাকার দাবি আজ চূড়ান্ত রূপ নিয়েছে। মন্ত্রী, এমপি ও সরকারি কর্মচারীদের বেতন দ্বিগুণ হওয়ার সাথে সাথে বাজারে জিনিসপত্রের দাম চরম বৃদ্ধি পেয়েছে, যা আজ সকল মাত্রা ছাড়িয়ে গেছে। এরই মধ্যে সরকার কয়েক দফা গ্যাস ও বিদ্যুতের দাম বাড়াল। বাড়ি ভাড়া নিয়ন্ত্রণ আইন কার্যকর না থাকায় প্রতিবছর বাড়িভাড়া বেড়েই চলছে। তাই মজুরি বৃদ্ধির প্রায় পাঁচ বছর হয়ে যাওয়ার পরও মজুরি আন্দোলনের যৌক্তিকতা নিয়ে যাঁরা প্রশ্ন করছেন তাঁরা কোনকালেই শ্রমিকদের আন্দোলনের যৌক্তিকতা খুঁজে পান না; বরং শ্রমিকরা কেন তাদের পেটের ক্ষুধার কথা বলে রাস্তায় নেমে আসে তা নিয়ে প্রচণ্ড ক্ষুব্ধ হয়ে থাকেন।

পোশাক শিল্পের মালিকরাসহ অনেকেই ন্যূনতম মোট মজুরি ১৬০০০ টাকার যৌক্তিকতা নিয়ে প্রশ্ন তুলছেন। আমরা যে কোন স্থানে প্রকাশ্য বিতর্কে অংশ নিয়ে আমাদের দাবির ন্যায্যতা, যৌক্তিকতা ও ফিজিবিলিটি প্রমাণে প্রস্তুত আছি। বর্তমানে প্রাপ্ত মজুরিতে ক্ষয়কৃত ক্যালরি পূরণের মত খাদ্য, স্বাস্থ্যসম্মত বাসস্থান, চিকিৎসা, বিনোদনের চাহিদা পূরণ না হওয়ায় পোশাক শ্রমিকরা মাত্র ৪০-৪৫ বছর বয়সে রোগাক্রান্ত হয়ে কর্মক্ষমতা হারাচ্ছে। ক্রমান্বয়ে শ্রমশক্তি ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ায় শিল্প ও রাষ্ট্র হুমকির সম্মুখীন হচ্ছে। শ্রমিকদের উৎপাদন ও উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির স্বার্থেই শ্রমিকের প্রয়োজনীয়তার বিষয়গুলো বিবেচনায় নিতে হবে। পুষ্টিবিজ্ঞানীদের হিসাব মতে, একজন সাধারণ মানুষের দৈনিক ২৩০০ কিলোক্যালরি শক্তি প্রয়োজন। কিন্তু পোশাক শ্রমিকসহ কঠিন কায়িক শ্রম যারা করে, তাদের দৈনিক ৩০০০ কিলোক্যালরি খাদ্য গ্রহণ করা প্রয়োজন। পোশাকশিল্পের এলাকাগুলোতে সবচেয়ে সস্তা দরের ১০ ফুট বাই ১০ ফুট মাটির ভিটার ঘরের ভাড়া সাড়ে তিন থেকে চার হাজার টাকা। দুই সন্তানসহ একটি পরিবারে খাওয়া খরচ, বাসাভাড়া, যাতায়াত, চিকিৎসা, পোশাক ও অন্যান্য খরচ হিসাব করলে সবচেয়ে অস্বাস্থ্যকর বাসস্থান এবং সবচেয়ে সস্তা খাবার খেয়ে বর্তমান বাজারে কোনভাবেই আর চালানো সম্ভব হচ্ছে না। শ্রমিকের সন্তানের শিক্ষা ও চিকিৎসা নিশ্চিত করাও সম্ভব নয়। এটাই শিল্পের ভেতরের চেহারা, শুধু বিলিয়ন ডলার রফতানি আয়ের যে বাহ্যিক চাকচিক্য তা দেখে আত্মতুষ্টিতে থাকলে এ সুখ বেশিদিন টেকসই হবে না।

পোশাক শ্রমিকদের মজুরি গত চার দশকে চারবার বৃদ্ধি পেয়েছে। প্রতিবারই শ্রমিকদের দাবির অর্ধেকেরও কম মজুরি দেয়া হয়েছে, যা তখনকার বাজারদরের সাথে মোটেও সংগতিপূর্ণ ছিল না। আপাতদৃষ্টিতে মজুরি বৃদ্ধি পেলেও প্রকৃত মজুরি সব সময় কমে গেছে, প্রতিবারেই শোষণের মাত্রা বেড়েছে এবং শ্রমিকদের জীবনের অবস্থার মৌলিক কোন পরিবর্তন হয়নি। পোশাক শ্রমিকরা অন্যান্যবারের মত প্রতারিত হতে চায় না। শিল্পের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি ও পরিস্থিতি স্বাভাবিক রাখতে হলে পোশাক শ্রমিকদের নিম্নতম বেসিক মজুরি ১০০০০ টাকা এবং মোট মজুরি ১৬০০০ টাকার যৌক্তিক ও ন্যায্য দাবি মেনে নিতে হবে। শিল্প বাঁচাতে হলে শ্রমিক বাঁচাতে হবে। ১৬০০০ টাকা নিম্নতম মজুরি নির্ধারণ করা হলে উভয়ই বাঁচবে।

জলি তালুকদার: সাধারণ সম্পাদক, গার্মেন্ট শ্রমিক ট্রেড ইউনিয়ন কেন্দ্র।
ইমেইল: joly_talukder@yahoo.com

২০১৭ সালে জনস্বাস্থ্য ইনস্টিটিউটের পরীক্ষিত নমুনায় ভেজালের হার

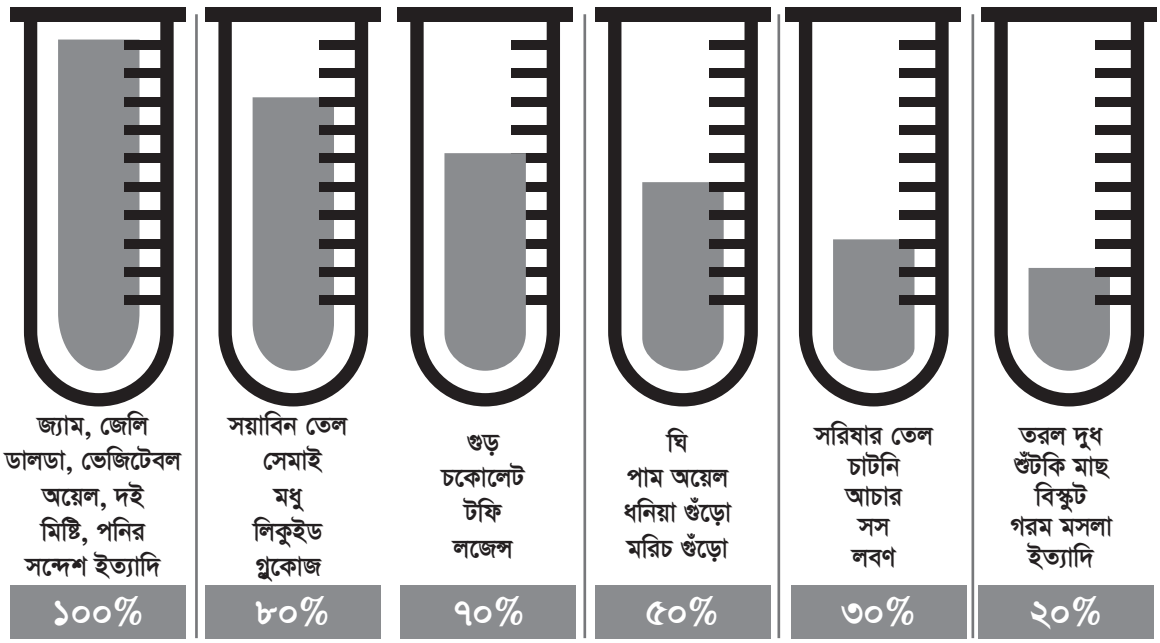

সূত্র: বণিক বার্তা, ৩ এপ্রিল, ২০১৮